বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের উন্নয়ন বিকল্প

আশরাফ আলী

(১) অবতারণা

একথা বলাই যথেষ্ট হবে না যে, বাংলাদেশের উপযোগী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে ''মুক্তবাজার অর্থনীতি''। প্রকৃত সমস্যা হলো : ''কিভাবে বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাবে''। স্পষ্টতঃ মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রতিযোগী আজ আর সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ব্যবস্থা নয়, বরং মুক্তবাজার পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রতিযোগিতা করছে একটি বাণিজ্য-প্রধান পরাধীন ও নিশ্চল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে। বর্তমান আমলা ও ট্রেডার শ্রেণীসহ দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল, যেমন, আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনালিষ্ট পার্টি অথবা জাতীয় পার্টি বিদেশী পুঁজির সেবায় ন্যস্ত রয়েছে। বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা আরো নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করার উপদেশ দিচ্ছি নে। তবে একথা বুঝতে হবে, সরকারী হস্তক্ষেপ বিবর্জিত অবাধনীতি বা মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা উপরোক্ত শ্রেণীগুলির স্বার্থ-বিরুদ্ধ। তাহলে স্পষ্ট এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশে একটি মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা যাবে কিনা এবং গেলে তা কেমন করে সম্ভব হবে? যদি না করা যায়, তাহলে অন্য কোন বিকল্প আছে কিনা?

(২) যথোপযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্বাচন

আজকের অর্থনীতিশাস্ত্রে জাতীয় উন্নয়নে রাস্ট্রের উপকারী ভূমিকাকে পুরোটা স্বীকৃতি দেওয়া হয় না অথবা নীচু করে দেখা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তথাকথিত ''এশীয় অলৌকিক ঘটনা''র কথা উল্লেখ করা যায়। দেখা গ্যাছে, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের এশীয় নব-শিল্পায়িত দেশগুলি (এন-আই-সি) মূলতঃ রাস্ট্রযন্ত্রের পথনির্দেশনায় অভূতপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করেছে। যেমন, দক্ষিণ কোরিয়া এই উন্নতি সাধন করতে গিয়ে মুক্তবাজার নীতি অনুসরণ না করে বরং উল্টোটাই করেছে। কোরিয়া-র ব্যবহৃত উন্নয়ন নীতিকে ন্যায়সঙ্গতভাবে এক ধরণের ''রাস্ট্রতান্ত্রিক পুঁজিবাদ'' নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

এটি ছিল একটি নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি। এই অর্থনীতি যেখানে নিজ গতিতে স্বয়ংক্রিয় হতে পারেনি, অথবা সাধারণ পথনির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে রাস্ট্র বেসরকারী ব্যবসার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত শক্ত হাতে প্রভাবিত করেছে। লক্ষ্য করুন, বাংলাদেশ এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে সরকার এবং সরকারী আমলা বিদেশী কোম্পানীর স্বার্থসেবায় নিয়োজিত থাকে অথবা থাকতে বাধ্য হয়। উল্টোদিকে, একই রাস্ট্রযন্ত্র এশীয় এন-আই-সিগুলির ক্ষেত্রে স্বদেশে অভূতপূর্ণ অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছে।

জাপান ও এশীয় এন-আই-সিগুলিতে সফল রাস্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পরিষ্কার নজির থাকা সত্ত্বেও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রকাশনাতে এ-ঘটনার গুরুত্বকে খাটো করে দেখা হয়েছে। এই প্রকাশনাতে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের এশীয় এন-আই-সিগুলির প্রথমদিকের রাস্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণী ব্যর্থতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি, এই রাস্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে আদৌ ব্যর্থ বলা যাবে না। এই সময়কালের জোরালো ''শিল্পক্ষেত্রে রাস্ট্রীয় হস্তক্ষেপ'', ''পূবদিকে তাকাও নীতি'' বাস্তবায়ন এবং ''মৌলিক ভারী শিল্পের মধ্য থেকে বিজয়ী নির্বাচন ও জন্ম দেওয়া'' - এইসব কার্যক্রমের মাধ্যমে জাপান ও এশীয় এন-আই-সিগুলি তাদের অধিকাংশ ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ করে নিয়েছিল যা তাদেরকে পরবর্তীকালে

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করার শক্তি জুগিয়েছিল।

উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ কোরিয়ার ১৯৭১ সনে চালু-করা এইচ-সি-আই (ভারী ও রসায়ণ শিল্প) উদ্যোগের অধীনে রাস্ট্র স্বদেশী অর্থনীতি প্রতিরক্ষার মাত্রা চড়িয়ে দেয় এবং ইস্পাত, জাহাজ-নির্মাণ, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, পেট্রো-রসায়ণ ও ধাতুশিল্পের ফার্মগুলিকে অনেক উৎসাহমূলক সাহায্য প্রদান করে। রাস্ট্র এই ফার্মগুলির কর্মোদ্যোগকে খুব সতর্কতার সাথে নিয়ন্ত্রন করে। দক্ষিণ কোরিয়া এক দশকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করে এবং ১৯৮০ দশকের প্রথমার্থে এসে বাণিজ্যিক লেনদেন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সামনে মুক্ত করতে শুরু করে।

১৯৭০ দশকের শুরু থেকে তাইওয়ানের ভারী ও রসায়ন শিল্পক্ষেত্রে 'বৃহৎ ধাক্কা', ১৯৮১ সনের শুরু থেকে মালয়েশিয়ার এইচ-আই-সি-ও-এম (মালয়েশিয়ার ভারী শিল্প কর্পোরেশন) উদ্যোগ এবং ১৯৮০ দশকের শুরু থেকে ইন্দোনেশিয়ার আই-পি-এল (বিনিয়োগ নীতি তালিকা) উদ্যোগের মধ্যে রাস্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনের অনুরূপ প্রবণতা পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করা যাবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই দেশগুলি রাস্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে প্রথমতঃ শিল্পসংশ্লিষ্ট কারিগরী শক্তি সঞ্চয় করে এবং এরপর পরবর্তীতে তাদের অর্থনীতি উন্মুক্ত করতে শুরু করে। সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক নথিপত্র ঘাটলে এর সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

উনিশ শো ষাট ও সত্তুর দশকে কতগুলি অর্থনীতিতে মধ্যম গোছের আমদানী প্রতিরক্ষা দেখা যায়। পূর্ব এশিয়াতে এরূপ প্রতিরক্ষা সচরাচর রপ্তানী সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পুষিয়ে নেওয়া হলেও ১৯৮০ দশকের মাঝখান পর্যন্ত এসেও কারখানা উৎপাদনে কার্যকরী প্রতিরক্ষার হার ছিল কোরিয়াতে প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ, থাইল্যাণ্ডে শতকরা ৫০ ভাগ এবং ইন্দোনেশিয়াতে শতকরা ৭০ ভাগ। তবে এই দশকের শেষে এসে রপ্তানী ও অর্থনীতির উপকারার্থে এই হার অনেক কমিয়ে আনা হয়েছিল।

এই শিল্পগুলিতে প্রথমদিকে যেসব অদক্ষতা বিরাজমান ছিলো, পরবর্তী পর্যায়ে অর্থনীতি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সামনে উন্মুক্ত করার পর তা সংশোধন করা হয়েছে। অর্থনীতিগুলির উপর দেশওয়ারী গবেষণার সারসংক্ষেপ দিতে গিয়ে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রকাশনা বলার চেষ্টা করেছে, সবগুলি দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথমার্ধে নীতিনির্ধারণী ভুল করেছে যা তারা দ্বিতীয়ার্ধে এসে শুধ্‌রিয়েছে। আমরা উপরে দেখেছি, এই ব্যাখ্যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

অনেক সময় এশীয় এন-আই-সির অর্থনৈতিক নীতিমালাকে ''রপ্তানীমুখী'' এবং ''আমদানী প্রতিস্থাপন'' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সত্যিকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের আলোচনায় এসব আখ্যা আসলে অবান্তর। একথা সুবিদিত যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যতিরেকে বাঁচতে পারে না। সুতরাং যে-কোনো পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে তার বেঁচে থাকার তাগিদে কোনো এক সময় সফলভাবে রপ্তানী করতেই হবে। এর বিপক্ষে ''স্বদেশী অর্থনীতি যত বড় হয়, বৈদেশিক বাণিজ্য তত কম হয়'' এই ধরণের যুক্তি থাকা সত্ত্বেও একথা সত্যি। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাস্ট্রে বৈদেশিক বাণিজ্য পুরো অর্থনীতির মাত্র ১২ শতাংশ হলেও বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যতিরেকে এদেশের অর্থনৈতিক চেহারা বদলে যেতো। দ্বিতীয়তঃ অর্থনীতি যখন সফলভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে মুক্তভাবে প্রতিযোগিতা করার জন্য তৈরী হবে তখন তা প্রায় যে-কোনো আবশ্যকীয় পণ্য প্রতিস্থাপন বা উৎপাদন করার ক্ষমতা অর্জন করবে।

জাপানসহ প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের এন-আই-সি তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও নীতিমালা মুক্তবাজার নয়, বরং রাস্ট্রীয় প্রতিরক্ষা ও নিয়ন্ত্রনের বলে পরিচালনা করে থাকলেও এগুলি হচ্ছে এক ধরণের পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থা, কমুনিস্ট বা সমাজবাদী ব্যবস্থা নয়। প্রথম প্রজন্মের এন-আই-সি ও জাপানের অর্থনৈতিক ইতিহাস থেকে পরিস্কার দেখা যাবে, এর মধ্য থেকে বেশ কয়েকটি শ্রেণীর ''পুঁজিবাদী'' অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সনাক্ত করা যাবে। সত্যি বলতে কি,

একদিকে কোরিয়ার কড়া রাস্ট্র-নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি এবং অপরদিকে হংকং-এর রাস্ট্র-নিয়ন্ত্রনবিবর্জিত বিশুদ্ধ মুক্তবাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা - এদুটি ''পুঁজিবাদী ব্যবস্থা''র দুই অন্তিম প্রান্তে অবস্থিত। তথাপি এদের সবগুলিই নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে গণ্য হবে এবং যেগুলি সর্বাধিক কট্টর রাস্ট্রের নিয়ন্ত্রন ও পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নতিলাভ করেছে সেগুলিকেও কমুনিস্ট বা এমনকি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে ভুল করা যাবে না।

এই নিবন্ধে বিশ্বের সাম্প্রতিক উন্নয়ন অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে কোনো সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করা হবে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশের জন্য মুক্তবাজার অর্থনীতি ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় হলেও এমতাবস্থায় তা অর্জন করা কঠিন অথবা প্রায় অসম্ভব। অপরদিকে, এশীয় এন-আই-সি ধাঁচের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার একটি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী রাস্ট্র - সেটিও বাংলাদেশের জন্য একটি একই রকম কঠিন প্রস্তাবনা।

(৩) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

বিভিন্ন মহলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের বিষয়টি অযথা অনেক গুরুত্ব পেয়েছে। তাই এতদ্‌সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণী বক্তব্যটি এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেওয়া হবে : কিছু কিছু অর্থনীতিবিদ ''জনসংখ্যা বৃদ্ধি''কে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অন্যতম ধর্তব্য বিষয় হিসাবে গণ্য করেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৬ সনে প্রফেসর নূরুল ইসলাম এই নীতিনির্ধারণী বক্তব্য রাখেন : ''বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলে প্রথমতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো ও একটি শিক্ষিত, সুপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমশক্তি অর্জনের উপর জোর দিতে হবে; দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচীকে প্রধানতঃ জনশক্তি নিয়োগমুখী ও শ্রম-নিবিড় করে সাজাতে হবে।'' কিন্তু ''জনসংখ্যা বৃদ্ধি'' বাংলাদেশ অথবা যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের প্রাথমিক কারণ নয়। আমি এ-বিষয়ে আবু আবদুল্লাহ সাহেবের সাথে একমত। তদানীন্তন এরশাদ প্রশাসন ''জনসংখ্যা বৃদ্ধি''কে ''এক নম্বর সমস্যা'' হিসাবে সনাক্ত করলে আবু আবদুল্লাহ এই সিদ্ধান্তকে এভাবে খণ্ডন করেন :

''অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এই অজুহাতের মাধ্যমে দুটি উদ্দেশ্য হাসিল করা হয় : প্রথমতঃ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে দায়মুক্তির অগ্রিম চেষ্টা, যেমন, এর জন্য মানুষকে এই বলে দোষারোপ করা যে তারা ''খরগোশের মতো ভুরি ভুরি জন্ম দিচ্ছে'' এবং দ্বিতীয়তঃ, দাতা দেশগুলিকে খুশী করা যারা দেখতে চায় তৃতীয় বিশ্ব এইরূপ অবস্থান গ্রহণ করুক। (এর থেকে অনুমান করা উচিৎ হবে না যে আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে একটি সত্যিকার ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে মনে করি না, কিন্তু এটি কচিৎ ''এক নম্বর'' সমস্যা)।''

(৪) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর সম্ভাব্য গবেষণার বিষয়

এখানে কয়েকটি সম্ভাব্য গবেষণার বিষয় তালিকাভূক্ত দেওয়া হলো। অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা বিষয়গুলি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণা করতে পারেন। গবেষণাকাজে প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ মাঠ-জরীপ থেকে আহৃত এবং সরকারী রিপোর্ট ও পরিসংখ্যান হাতবই থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নিরীক্ষাভিত্তিক প্রণালী প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ প্রকাশিত বইপুস্তকের ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ ব্যবহার করা যেতে পারে :

১। বিশটি বড় বড় এনজিও নির্বাচন করে তাদের প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ অর্থ-লেনদেন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড অধ্যয়ন করুন। বিশেষতঃ,
(ক) বিভিন্ন দাতা দেশ থেকে অর্জিত তহবিলের পরিমাণ রেকর্ড করুন।
(খ) এনজিও কর্তৃক সৃষ্ট কার্যকলাপের সমর্থনে দাতা দেশগুলি থেকে উচ্চমূল্যের পণ্যদ্রব্য আমদানী রেকর্ড করুন।

(গ) তাদের যেসব কার্যকলাপ পুঁজি-সঞ্চয় নিরুৎসাহিত করে এবং কারিগরী জ্ঞান অগ্রগতিতে নিশ্চলতা আনে সেগুলি রেকর্ড করুন।
(ঘ) বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীরা যেসব তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন তাত্ত্বিক কর্মতৎপরতায় নিযুক্ত রয়েছেন সেগুলি রেকর্ড করুন। তুলনা করে দেখুন এই কর্মতৎপরতার প্রভাব জাতীয় উন্নয়নের উপর কতটা অকিঞ্চিৎকর।

২। তিনটি ক্ষমতাশীন গ্রুপের (সরকারী কর্মকর্তা, আমলা ও ট্রেডার) কার্যকলাপ সাক্ষ্যসাবুদসহ বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন ও দলিলভূক্ত করুন। অর্থাৎ বাংলাদেশে অনুমোদিত বড় বড় প্রকল্প এবং এগুলি দ্বারা সৃষ্ট উচ্চমূল্যের পণ্য, যেমন, ক্যাপিটাল গুড্স্-এর চাহিদা তদন্ত করুন। এইসব প্রকল্প অনুমোদনের মাধ্যমে এই তিনটি গ্রুপ কিভাবে ফয়দা আদায় করে তা অধ্যয়ন করুন।

৩। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্ম এন-আই-সি উত্থানের ইতিহাস পর্যালোচনা করুন :
(ক) ডব্লিউ-বি (ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক) ও আই-এম-এফ (ইন্টারন্যাশনাল মোনেটরী ফাণ্ড) কর্তৃক প্রকাশিত বই ও রিপোর্টের সমালোচনা লিখুন।
(খ) এতদঞ্চলের সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক সাক্ষ্য উপস্থাপন করুন।

৪। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে জাপানের বৈদেশিক বিনিয়োগ অধ্যয়ন করুন :
(ক) পূর্ব এশীয় দেশগুলিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক খুঁটিনাটি সংগ্রহ করুন।
(খ) প্রতিটি দেশ এবং শিল্পে জাপানী বিনিয়োগ কর্মসূচী রেকর্ড করুন।
(গ) পূর্ব এশীয় দেশগুলিতে জাপানী পুঁজি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্মিত পণ্যদ্রব্যের ধরণ ও প্রকৃতি রেকর্ড করুন।
(ঘ) এসব দেশে উচ্চপ্রযুক্তি উচ্চমূল্য জাপানী পণ্য বিক্রির তথ্য সংগ্রহ করুন।

৫। ইউ-এস-এ-আই-ডি, সি-আই-ডি-এ, এস-আই-ডি-এ, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ কার্যক্রম অধ্যয়ন করুন :
(ক) বাংলাদেশে হাতে-নেওয়া প্রকল্পগুলি অধ্যয়ন করুন।
(খ) বাংলাদেশের বর্তমান শুল্ককাঠামো অধ্যয়ন করুন, বিশেষতঃ সেই বিধ্বংসী শুল্ককাঠামো যার অধীনে উচ্চমূল্য পণ্যের উপর নামমাত্র ২.৫% আমদানী শুল্ক বসানো হয় এবং অপরপক্ষে স্বদেশে স্থানীয়ভাবে এইসব উচ্চমূল্য পণ্য নির্মাণে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও অন্যান্য উপাদানের উপর ৫০% থেকে ১৫০% আমদানী শুল্ক আরোপ করা হয়।

৬। উন্নয়নশীল দেশ : যেমন, চিন, কিউবা, ভিয়েটনাম, পূর্ব এশীয় দেশ, ভারত উপমহাদেশে সংঘটিত তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস অধ্যয়ন করুন এবং প্রমাণ করুন এগুলি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বই আর কিছু ছিল না।

(৫) পরিশেষ মন্তব্য

মুক্তবাজার নীতি গ্রহণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে একথা বলাটাই যথেষ্ট নয়। যেসব অর্থনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারক সরল মুক্তবাজার নীতিকে সর্বরোগের মহৌষধ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য বক্তব্য দেন, তাঁরা সমস্যাটির বিশালতা বুঝতে ব্যর্থ হন। একটি পুরো বিপ্লবের কমে ন্যায্য মুক্তবাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। সেই বিপ্লবের নাম তথাকথিত ‘‘পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক বিপ্লব’’। সুতরাং অর্থনীতিকদের কাজ হবে (ক) ‘রেন্ট-সিকিং’ কর্মকাণ্ড দ্বারা অধ্যুষিত অর্থনীতির বর্তমান গতির দিক কিভাবে বদলানো যাবে এবং (খ) বাংলাদেশে কিভাবে একটি ন্যায্য মুক্তবাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাবে তার নীলনক্সা দেওয়া।

দ্বিতীয়তঃ, মুক্তবাজার নীতিতে বিশ্বাসকারী অর্থনীতিবিদগণ প্রায়ই প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্ম এশীয় নব-শিল্পায়িত দেশ, যেমন, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চিন, ইত্যাদিতে সংঘটিত অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নতির ধরণ নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। কিন্তু এই অর্থনীতিকরা এ-ঘটনা ভুলে যান যে, অধিকাংশ এন-আই-সি মুক্তবাজার নীতি অবলম্বন করেনি, বরং তারা কঠোরভাবে রাস্ট্র দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী উন্নয়ন কর্মসূচী ও নীতিমালা গ্রহণ করেছে।

বলে রাখা ভালো, আমরা এখানে রাস্ট্র-নিয়ন্ত্রনাধীন প্রতিরক্ষাধর্মী অর্থনীতি ব্যবস্থার সপক্ষে রায় দিচ্ছি নে। তবে কারো মধ্যে 'জাতীয়তাবাদী' অনুভূতি থাকাটা অপরাধ নয়। মূল এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হলো : মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ঘটানো, বিশ্বের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের সামনে ভালো সাজা নয়। 'গণতন্ত্র' আর্থ-সামাজিক উন্নতির অনুকূলে কাজ করলে গণতন্ত্রই সই, নইলে নয়। আবার, দেশের দুঃস্থ মানুষের অব্যর্থ উন্নতির কাজে রাস্ট্রীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজন পড়লে সকলকে তার সপক্ষেই কাজ করা উচিৎ। আসলে এই নিবন্ধে আমরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমস্যার নির্দিষ্ট কোনো সমাধান বাতলিয়ে দেবার চেষ্টা করিনি। অন্য আরেকটি ভবিষ্যৎ নিবন্ধে একটি বিকল্প পরিকল্পনা অনুসন্ধান করে দেখার প্রতিশ্রুতি রইলো।